আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ ও সংগীতপ্রসঙ্গ

অসিত দে

সামনের গাছপালা, উঁচু-নীচু পথঘাট, আকাশের চাঁদ-সূর্য আর বহু দূরের অসংখ্য তারার দল—আমরা আজ এখানে না থাকলে এরা ঠিক যেমন, তেমনটিই থাকত? দেশকালে বিস্তৃত এই বিশ্ব, তার মাঝে জার্মানির ব্রান্ডেনবুর্গ (Brandenburg)-এ কাপুট গ্রামে মুখোমুখি বসে আছেন সত্তর বছরের কবি আর পঞ্চাশোর্ধ বিজ্ঞানী। গ্রীষ্মের পড়ন্ত বেলা। কবি বললেন, সামনের এই টেবিলটির বাস্তবতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর সব কিছুর মতোই মানবমনের অনুভূতির সৃষ্টি। আলুথালু বিজ্ঞানী কথায় অনেক সংক্ষিপ্ত, হয়তো নিজের তোলা এই প্রশ্নে নিজের মনেই চলছিল সংঘাত, কিন্তু কবির কথা মানতে চাইলেন না। অনপেক্ষ বাস্তবতা—তাঁর মেধা এটাই মানতে চাইল।

এই বাস্তবতারই এক ধরনের প্রকাশ সংগীত। কবি টেনে আনলেন সংগীতকে তাঁর কল্প-উপমায়। এমন একটি মানবমনের কল্পনা কি করা যায় না যার শুধু সময়ের বোধ আছে, দেশের অনুভূতি নেই। সেই মানুষের কাছে শুধু সময়ে এগিয়ে চলা বিষয়ের বোধ আছে, যেমন সংগীত। ঘরবাড়ি, মাঠঘাট এসব নেই, পিথাগোরাস (Pythagoras)-এর জ্যামিতি মূল্যহীন। কল্পনা ও যুক্তির এই ছটা বিজ্ঞানীকে নিশ্চয়ই আনন্দ দিল, এর থেকে কম তিনি আশাও করেননি। তবে বিজ্ঞানীর পক্ষে এই কল্প-উপমার যুক্তি পুরোপুরি মানা সম্ভব নয়। কারণ, ভৌতজগতে সংগীতের সৃষ্টি সুরেলা ধ্বনি থেকে, আর ধ্বনির সৃষ্টি দেশে বিস্তৃত বস্তুর সময়ের সাথে আন্দোলনে—অর্থাৎ সংগীত সৃষ্টির সাথে দেশকাল উভয়ই জড়িয়ে আছে। বিজ্ঞানী অবশ্যই এই পালটা যুক্তিতে গেলেন না।

মাসখানেক পর বার্লিনে উভয়েরই বন্ধু টোনি মেন্ডেল (Toni Mendel)-এর বাড়িতে আবার দেখা হলো। আলোচনার প্রথমাংশ বিজ্ঞানবিষয়ক এবং একেবারেই জমল না। বিজ্ঞানবিশ্বে তখন আলোড়ন ফেলেছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব—এর আগের বছর কলকাতা ঘুরে যাওয়া ভের্নের হাইজ়েনবার্গ (Werner Heisenberg) এই নতুন তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণু বা তাদের ভেতরের মৌল কণাদের গতিবিধির মধ্যে একরকম অনিশ্চয়তা আছে। তাদের ক্ষণিক অবস্থান নির্দিষ্টভাবে জানলে তাদের গতিবেগের (ঠিকভাবে বলতে গেলে, ভরবেগের) কোনো হদিশ পাওয়া যাবে না। দুটোই একসাথে জানতে গেলে উভয়ের মধ্যেই খানিকটা অনিশ্চয়তা থাকবে। অতি ক্ষুদ্র কণাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই নতুন তত্ত্ব আইনস্টাইন অবশ্যই অনুধাবন করেছিলেন, কিন্তু কোনো দিনই ঠিক মেনে নিতে পারেননি। সেদিন অবশ্য এই তত্ত্বের সরাসরি বিরোধিতা না করে এক সমান্তরাল রাস্তায় হাঁটলেন। স্পষ্ট করে দিলেন, কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাথে কার্যকারণ সম্পর্কের কোনো বিরোধ নেই, মৌল কণারাও রাশিবিজ্ঞানের সূত্র মেনে চলে এবং ক্ষুদ্র কণার গতিপথের অনিশ্চয়তা থাকলেও স্থূল বস্তুর গতিপথ নির্ধারণে কোনো অসুবিধা নেই।

মনে হয় কবি বুঝলেন এই আলোচনা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। দুজনের কথা সমান্তরাল পথে চলেছে, সীমিত সময়ের মধ্যে তাদের মিলবার কোনো সম্ভাবনা নেই। মসৃণভাবে কবি আলোচনাটিকে নিয়ে এলেন সংগীতে। ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় তখন পশ্চিমি দুনিয়ার কাছে ছিল না। পশ্চিমি ভাষাতাত্ত্বিকরা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতের কথা জানতেন, মাক্স মুলার (Max Müller) সাহেবের বৈদিকচর্চাও ঘটে গেছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কার হয়েছে সবেমাত্র। আনা পাভলোভা (Anna Pavlova)-র সাথে উদয়শঙ্করের পরিচয় ঘটেছে বছর দশেক আগে, তাঁরা রাধাকৃষ্ণ যুগলনৃত্যও পরিবেশন করেছেন পশ্চিমি দর্শককুলের সামনে। কিন্তু উদয়শঙ্কর তাঁর নৃত্যগোষ্ঠী তখনও তৈরি করে ওঠেননি। কয়েক বছর আগে সত্যেন বোসের সাথে আইনস্টাইনের সম্যক পরিচয় হয়েছে। মোটামুটি এটুকুই, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় মনন ও সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় পশ্চিমিরা তখন পাননি। আইনস্টাইনও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

কবি ও বিজ্ঞানীর কথোপকথনে সংগীতের অংশটি পরিসরে খুব বড়ো না হলেও গভীরতার নিরিখে অনন্য। আলোচনাটির কতগুলি দিক বা ভাগ আছে। যেহেতু আলোচনাটি কথোপকথনভিত্তিক, নিবন্ধের ঢঙে দুজনের কেউই এতে বিষয়ভেদে সাবহেডিং দিয়ে দেননি। আমাদের পর্যালোচনায় কথোপকথনের মূল ক্রম বজায় রাখার কোনো প্রয়োজন দেখি না। বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণই শ্রেয়, এবং সময়মতো বিষয়গুলির সাবহেডিং আমরা দিয়ে নেব।

হার্মনি বনাম মেলডি

একটি মূল অংশ অবশ্যই পশ্চিমি সংগীতধারায় প্রচলিত হার্মনি ও ভারতীয় সংগীতের মেলডি নির্ভর কাঠামো নিয়ে এবং এদের তুলনামূলক আলোচনা। বর্তমান প্রেক্ষিতে এই অংশটি বহু আলোচিত ও গতানুগতিক মনে হলেও সেইসময় এই আলোচনার গুরুত্ব ছিল। মেলডি হলো একটি সুরপরম্পরা। ভাষার মতো এখানে সাংগীতিক বাক্য আছে যার একটি শুরু ও একটি শেষ আছে। বাক্যের প্রতিটি অংশের সাথে অন্য অংশের সুরগত অন্বয় আছে। একটি বাক্যের সাথে পরবর্তী বাক্যের সুরভাবের নৈকট্য ও পারম্পর্য আছে। সুরগত অন্বয় ও পারম্পর্য কতগুলি নিয়ম মেনে তৈরি হয়। এইভাবে তৈরি হওয়া বহু মেলডিকেই ভারতীয় সংগীতে রাগ নামে চিহ্নিত করা হয়।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, সুরের অন্বয় ও পারম্পর্যের যে-নিয়ম এই রাগরাগিণীর কাঠামো তৈরি করেছে তা কীভাবে নির্দিষ্ট হলো। ভৈরব রাগে শুদ্ধ গান্ধার থেকে শুদ্ধ মধ্যমে গিয়ে, সেখান থেকে শুদ্ধ গান্ধারযুক্ত মীড় সহযোগে কোমল ঋষভে আসাই হলো নিয়ম। কে বললেন এই নিয়মের কথা? সাধারণ উত্তর, গুরু বললেন। গুরুকে কে বললেন? তাঁর গুরু, ইত্যাদি। কিন্তু পরমগুরুর সন্ধান কোথায় পাব? আইনস্টাইন প্রকারান্তরে পশ্চিমি ধ্রুপদী সংগীতের প্রসঙ্গো মূলত এই মোক্ষম প্রশ্নই তুলেছেন। কিন্তু সে-কথায় পরে আসব। হার্মনি হলো একসাথে একাধিক সুরপরম্পরার উচ্চারণ, এক কথায় অনেক সুরের ঐকতান। পশ্চিমি ধ্রুপদী সংগীতের এক মূল উপাদান হার্মনি। ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতে হার্মনির স্থান নেই, এই সংগীত একান্তভাবেই মেলডি নির্ভর, রাগরাগিণী যার মূল ভিত্তি।

মেলডি ও হার্মনি নিয়ে এত কথা এই মনীষীদ্বয় বলেননি। আমরা একটু বিশদে পর্যালোচনা করে নিলাম, বোঝার সুবিধার্থে। আইনস্টাইন সংগীতে মেলডিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, অকপটে স্বীকার করেছেন যে, হার্মনির বাড়াবাড়িতে অনেক সময় সুর বা মেলডি চাপা পড়ে যায়। ভারতীয় সংগীতে মেলডির স্থান খুব উঁচুতে এবং তা খুবই সমৃদ্ধ জেনে বড়ো খুশি হয়েছেন। পশ্চিমি দুনিয়ায় জন্মে, ওখানকার ধ্রুপদী সংগীতের আবহে বড়ো হয়ে শুধুমাত্র সুরের পরে এতটা দরদ আমাদের অভিভূত করে। তিনি বরাবরই মাটির বড়ো কাছাকাছি এবং অন্তর্মুখীন ছিলেন—সুরের সাথে এর কী সম্পর্ক সে-বিষয় আপাতত মুলতুবি রাখি।

সৃজনের স্বাধীনতা

সংগীতসম্পর্কীয় কথোপকথনের দ্বিতীয় মূল বিষয় ভারতীয় সংগীতশিল্পীর নিজস্ব সৃজনক্ষমতা ও সৃজনের স্বাধীনতা। আসলে এই বিষয়টি নিয়েই এঁদের সংগীত-আলোচনার সূচনা—আমরা শুধু আলোচনার পরম্পরাকে আমাদের সুবিধামতো সাজিয়ে নিয়েছি।

নিয়মটি কীভাবে এল না বললেও, একটু আগেই মেলডির নিয়মকানুন নিয়ে আমরা কথা বলেছি। ভারতীয় সংগীতশিল্পীর কাছে মেলডির এই নিয়ম বন্ধন নয়, এক ধরনের মুক্তি। অনেকটা প্রকৃতির মাঝে মানবসত্তার সহাবস্থানের মতো। প্রকৃতি তার নিয়মে চলে—পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, আপেল গাছ থেকে পড়ে, চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। বিজ্ঞানী প্রকৃতির এইসব নিয়মের সন্ধান করেন, হয়তো না করলেও চলত। মানুষের অস্তিত্বের সাথে এইসব প্রাকৃতিক নিয়মের গূঢ় সম্পর্ক আছে। তবে মানুষের কাছে এগুলো স্বাভাবিক ঘটনামাত্র—এরই মাঝে মানুষ তার নিজস্ব চেতনালব্ধ স্বাধীনতায় খুশি থাকে। মেলডির নিয়মের মধ্যেও একইরকম একটা স্বাভাবিকত্ব আছে। স্বাভাবিকতা থেকে আসে স্বতঃস্ফূর্ততা, আর তা থেকে স্বাধীনতা। ভারতীয় সংগীতে সুরপরম্পরার নিয়মের মাঝেই নিহিত আছে সৃষ্টির বীজ। সৃষ্টির সাথে আত্মার যোগ আছে। সংগীতশিল্পীর আত্মার প্রকাশ এই সংগীতে।

এইরকম সংগীত নিয়ে নাড়াচাড়া আইনস্টাইন ইত্যবধি করেননি—শোনেনওনি এমনতর কথা। কিন্তু শোনামাত্র এই সংগীতের অন্তর্নিহিত শক্তি ও ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতপ্রতিভা নিয়ে নতুন করে কিছু বলা বাহুল্য। আইনস্টাইন একজন সাধারণ মানের বেহালাবাদক ছিলেন, কিন্তু সংগীতের অন্দরমহলের অনেকগুলো দরজা তাঁর কাছে নিশ্চয়ই খোলা ছিল। নতুবা শুধু সংক্ষিপ্ত কথোপকথন থেকে, টীকা সহকারে যার কিছু সবিস্তার আলোচনা আমরা এখানে করার চেষ্টা করছি, তাঁর পক্ষে ভারতীয় সংগীতের কিছুটা হদিশ পাওয়া বা তার শক্তিসমৃদ্ধির মূলভাবটিকে ধরতে পারা সম্ভব ছিল না।

প্রকৃতি পরমগুরু

এরপর আমরা যাব কথোপকথনের শেষ অংশে—আইনস্টাইনের একটি গভীর প্রশ্ন এবং রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত উত্তর, যা আপাতভাবে সম্পর্করহিত বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীত শুনে যে আনন্দগ্রহণ, তা কি প্রথাবদ্ধতার কারণে না এর কোনো মৌলিক কারণ আছে, আইনস্টাইনের এই প্রশ্ন ভারতীয় সংগীত, বিশেষভাবে ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের ক্ষেত্রেও খাটে। দার্জিলিং চা সেবনের অনুভূতি একটি অর্জিত বা চর্চিত স্বাদ, এই স্বাদ গ্রহণের মৌলিকতা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায় অর্থাৎ এই চা সকলের কাছে কোনো মৌলিক কারণবশত সুস্বাদু না-ও হতে পারে। এ প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের সেই পরমগুরুর সন্ধান পেতে হবে, যিনি প্রথম বলে দিলেন—এই এই স্বর এই পরম্পরায় প্রয়োগ করলে তা সংগীত হয়ে ওঠে বা শ্রুতিসুখকর হয়। এই পরমগুরু আর কেউ নন, স্বয়ং প্রকৃতি। প্রকৃতির নিয়মেই বিশেষ দুই বা ততোধিক স্বরের পারম্পর্য বা সহউচ্চারণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মস্তিষ্কে আনন্দানুভূতি জাগায়।

এ কথাটা বুঝতে হলে সহজ কয়েকটি হিসেব কষতেই হবে। যেকোনো সাংগীতিক ধ্বনি বা স্বর আসলে অনেকগুলি শব্দতরঙ্গের গুচ্ছ—তার একটি মূল কম্পাঙ্ক (প্রতি সেকেন্ডে কম্পনের সংখ্যা) থাকে, অন্য কম্পাঙ্কগুলি মূল কম্পাঙ্কের পূর্ণ গুণিতক, যাদের হার্মনিক বলা হয়। ধরা যাক, একটি স্বর যাকে ষড়জ বা সা বলা যেতে পারে—তার মূল কম্পাঙ্ক বা প্রথম হার্মনিক ৪০০। দ্বিতীয় হার্মনিকের কম্পাঙ্ক ২×৪০০ অর্থাৎ ৮০০, তৃতীয় হার্মনিকের কম্পাঙ্ক ৩×৪০০=১২০০, ইত্যাদি। এখন এমন আর একটি স্বরের কল্পনা করা যাক, যাকে আমরা পঞ্চম বা পা বলব, যার মূল কম্পাঙ্ক ষড়জের মূল কম্পাঙ্কের দেড় গুণ, অর্থাৎ $^{৩}/_{২}$×৪০০=৬০০। এমত পঞ্চম স্বরের দ্বিতীয় হার্মনিকের কম্পাঙ্ক ২×৬০০=১২০০, অর্থাৎ ষড়জ স্বরের তৃতীয় হার্মনিকের কম্পাঙ্কের সমান। এখন একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, ষড়জ স্বরের প্রতি তৃতীয় হার্মনিক (অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ইত্যাদি) আর পঞ্চম স্বরের প্রতি জোড় হার্মনিকের কম্পাঙ্ক একেবারে সমান—আর এই কারণেই ষড়জ ও পঞ্চম স্বর (সা-পা) পরপর বা একসাথে উচ্চারণ করলে সুরেলা মনে হয়। এটাও বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে ওপরের সিদ্ধান্তটি ষড়জ ও পঞ্চম এই দুই স্বরের মূল কম্পাঙ্কের অনুপাতের ওপরই একমাত্র নির্ভরশীল, যা কিনা এক্ষেত্রে $^{৩}/_{২}$। অর্থাৎ ষড়জের মূল কম্পাঙ্ক ৪০০-র বদলে যদি ৫০০ নিতাম (যাকে সাধারণভাবে আমরা 'স্কেলটা একটু চড়িয়ে নেওয়া' বলি), সেক্ষেত্রে পঞ্চম স্বরের মূল কম্পাঙ্ক হতো $^{৩}/_{২}$×৫০০=৭৫০। কিন্তু এক্ষেত্রেও ষড়জ স্বরের প্রতিটি তৃতীয় হার্মনিক আর পঞ্চম স্বরের প্রতিটি জোড় হার্মনিকের কম্পাঙ্ক সমান হতো। এর থেকে পরিষ্কার যে, স্বরসমূহের বা অন্তত দুটি স্বরের পারম্পরিক বা একসাথে প্রয়োগের শ্রুতিমধুরতা স্বর দুটির মূল কম্পাঙ্কের অনুপাতের ওপরই শুধু নির্ভর করে, কোনো বিশেষ কম্পাঙ্কের ওপর নয়। এটা তো পরীক্ষিত সত্য যে ষড়জের অবস্থান 'জি-শার্প' না 'সি'-তে নিলাম, তার ওপর কোনো গানের সুরমাধুর্য একেবারেই নির্ভরশীল নয়। শিল্পী তাঁর কণ্ঠশৈলী বুঝে ষড়জ নির্বাচন করেন।

ষড়জ-পঞ্চম স্বরসম্বন্ধকে ভারতীয় সংগীতের পরিভাষায় সম্বাদ বলা হয়ে থাকে, পশ্চিমিরা একেই বলেন consonance। আমরা অবশ্য আরও মৌলিক ও আরও সহজবোধ্য একটি স্বরসম্বন্ধকে খুব সহজেই এখন বুঝতে পারব। এই স্বরসম্বন্ধের নাম সপ্তক বা পশ্চিমি পরিভাষায় octave। এতে দুটি স্বরের মূল কম্পাঙ্কের অনুপাত $^{২}/_{১}$ অর্থাৎ একটি অন্যের দ্বিগুণ। মধ্যসপ্তকের

ষড়জ আর তারসপ্তকের ষড়জের মধ্যে এই সম্পর্ক—তারসপ্তকের ষড়জের মূল কম্পাঙ্ক মধ্যসপ্তকের ষড়জের মূল কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ। যেকোনো স্বরের মূল কম্পাঙ্ককে দ্বিগুণ করলে ওপরের সপ্তকে ওই একই স্বর পাওয়া যায়। সপ্তকসম্পর্ক সবচেয়ে সুরেলা, কারণ এতে ওপরের সপ্তকের স্বরটির প্রতিটি হার্মনিক নীচের সপ্তকের প্রতিটি জোড় হার্মনিকের কম্পাঙ্কের সমান।

এখন পর্যন্ত আমরা খোঁজ পেলাম দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতের যার সাথে দুটি সবচেয়ে মৌলিক স্বরসম্পর্কের যোগ আছে: ১) $^{২}/_{১}$ —সপ্তক সম্পর্ক, ২) $^{৩}/_{২}$—সম্বাদ অর্থাৎ ষড়জ-পঞ্চম সম্পর্ক।

এই পথে খুব সহজেই আরও কয়েকটি শ্রুতিসুখকর স্বরসম্পর্ক পাওয়া যাবে। মূল কম্পাঙ্কের $^{৪}/_{৩}$ অনুপাত থেকে ষড়জ-মধ্যম (সা-মা) সম্পর্ক, $^{৫}/_{৪}$ অনুপাত থেকে ষড়জ-শুদ্ধগান্ধার (সা-গা) সম্পর্ক এবং $^{৬}/_{৫}$ অনুপাত থেকে ষড়জ-কোমল গান্ধার (সা-জ্ঞ) সম্পর্ক। ষড়জ-মধ্যম সম্পর্ক আসলে ষড়জ-পঞ্চম সম্পর্কেরই রূপান্তর, কেননা মধ্যমকে ষড়জ ধরলে তারসপ্তকের ষড়জ হয় পঞ্চম, অর্থাৎ ষড়জ-মধ্যম সম্পর্কও আসলে একটি সম্বাদ বা consonance। একই রকমভাবে ষড়জ-শুদ্ধ গান্ধার-পঞ্চম (সা-গা-পা) এই মুখ্য ত্রিস্বরসম্পর্কের (major triad) মধ্যেই নিহিত ষড়জ-কোমল গান্ধার-পঞ্চম (সা-জ্ঞ-পা) এই গৌণ ত্রিস্বরসম্পর্ক (minor triad)। এর কারণ শুদ্ধ গান্ধারকে ষড়জ জ্ঞান করলে পঞ্চম তখন হয়ে যায় কোমল গান্ধার। পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতের যে-হিসেব ওপরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা থেকেই পরের এইসব সিদ্ধান্তে সহজেই পৌঁছোনো যায়। কোনো সংগীতরচনায় বা রাগরাগিণীতে ব্যবহৃত অন্য স্বরগুলির মূল কম্পাঙ্ক নির্ধারিত হয় প্রাসঙ্গিক ভাবে, ওপরের যেকোনো একটি স্বরসম্পর্ক ব্যবহার করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, গান্ধার থেকে ষড়জ-পঞ্চম সম্বাদ ব্যবহার করে নিষাদ (নি) স্বর পাওয়া যাবে, একইভাবে ষড়জ-মধ্যম সম্বাদ ব্যবহার করে ধৈবত (ধা) পাওয়া যাবে। আবার ধৈবত থেকে পঞ্চম-ষড়জ সম্পর্ক ব্যবহার করে ঋষভ (রে) পাওয়া যাবে, অন্য উপায়ে পঞ্চম থেকে মধ্যম-ষড়জ সম্পর্ক ব্যবহার করেও ঋষভ পাওয়া যাবে, কিন্তু এই দুই ঋষভের মূল কম্পাঙ্ক আলাদা হবে। শুদ্ধ স্বরপরম্পরা হলে দুটি ঈষৎভিন্ন শুদ্ধ-ঋষভ হবে (যার প্রমাণ পাওয়া যায় শুদ্ধকল্যাণ ও ভূপালিতে, যে রাগদ্বয়ে শুদ্ধ ঋষভের প্রাসঙ্গিক উচ্চারণ এবং মূল কম্পাঙ্কের স্থান সামান্য আলাদা) আবার কোমল স্বরপরম্পরা হলে দুটি কোমল ঋষভ (ঋ) পাওয়া যাবে—যার উদাহরণও রাগরাগিণীতে প্রচুর। এইভাবেই ভারতীয় সংগীতের রাগরাগিণীতে একই স্বরের শ্রুতিভেদ হয়—মারোয়ার কোমল ঋষভের চেয়ে শ্রীরাগের কোমল ঋষভ খানিকটা চড়া। এই শ্রুতিভেদের কারণও পরিষ্কার—কোন স্বর থেকে কোন স্বরসম্পর্কের ব্যবহারে একটি নতুন স্বরে উপনীত হচ্ছি, এই পরম্পরাই ঠিক করে দেয় নতুন স্বরের সঠিক স্থান। স্বরস্থান নির্ধারণের এই প্রক্রিয়া একটি প্রাকৃতিক নিয়ম, কারণ প্রক্রিয়াটি সাংগীতিক ধ্বনির হার্মনিকের ওপর নির্ভরশীল, ব্যক্তিসাপেক্ষ বা প্রথাসাপেক্ষ নয়। সারা পৃথিবীর সব লোকসংগীত যা মাটি থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জন্মেছে তার ভিত্তি এই হার্মনিক স্কেলে। ভারতীয় রাগসংগীতের মূল এই লোকসংগীত ও তার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক মেলডি বা সুরভাব। যুগসঞ্চিত সাধনা ও মেধান্বেষার ফল তার আজকের পরিশীলিত রূপ। বাংলা বাউল-ভাটিয়ালি থেকে রাজস্থানি লোকগান—রাগসংগীতের কাঠামো এসব গানে সহজেই পাওয়া যায়। এমনকী

আফ্রিকান লোকগানেও পাঁচ সুরের সারঙ বা ছ-সুরের বৃন্দাবনি সারঙের মূলভাবটি সহজেই চিনে নেওয়া যায়।

'পিয়ানো আমাকে বিভ্রান্ত করে'

মুশকিলটা হলো পাশ্চাত্য সংগীতে পিয়ানো জাতীয় কীবোর্ড সম্বলিত যন্ত্র আসার পর থেকে। পিয়ানোর প্রতিটি পর্দাকে নির্দিষ্ট সুরে বাঁধতে হবে আর তা করতে হলে হার্মনিকের ভিত্তিতে স্বরস্থান নির্ধারণ করা চলবে না, অর্থাৎ প্রকৃতির সাজিয়ে দেওয়া নিয়ম ভাঙতে হবে। পিয়ানোর মতো নির্দিষ্ট পর্দাযুক্ত যন্ত্রে কেন মাটি বা প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হার্মনিক স্কেল বজায় রাখা যাবে না, এর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। হার্মনিক স্কেলের যে-আলোচনা আমরা স্বল্প পরিসরে করেছি সেটাকে আর একটু বাড়ালেই আমরা লক্ষ করব যে, একটি সপ্তকের মধ্যে পরপর স্বরগুলির মূল কম্পাঙ্কের অনুপাত কখনো সমান নয়, অর্থাৎ কোমল ঋষভের (ঋ) মূল কম্পাঙ্কের সাথে ষড়জের (সা) মূল কম্পাঙ্কের অনুপাত, শুদ্ধ ঋষভের (রে) সাথে কোমল ঋষভের মূল কম্পাঙ্কের অনুপাতের থেকে ভিন্ন। পিয়ানোর ক্ষেত্রে এতে অসুবিধা কী? যদি স্কেল একটু নামাতে চড়াতে চাই, অর্থাৎ বর্তমান শুদ্ধ নিষাদকে (নি) বা কোমল ঋষভকে বা অন্য যেকোনো স্বরকে নতুন ষড়জ করতে চাই, তাহলে পরপর স্বরগুলির মূল কম্পাঙ্কের বর্তমান অনুপাত যা ছিল, ষড়জের নতুন অবস্থানের পর সেই অনুপাতগুলির প্রতিটি এখন ভিন্ন হবে; কারণ পিয়ানোর প্রতিটি পর্দার স্বরস্থান পূর্বনির্ধারিত, ইচ্ছে মতো বদলানো সম্ভব নয়। উদাহরণ দিয়ে বলি। ধরা যাক, বর্তমান শুদ্ধ ঋষভকে নতুন ষড়জের অবস্থান বলে মান্য করা হলো। তাহলে বর্তমানের ঋষভ-গান্ধার স্বরানুপাত হয়ে দাঁড়াবে নতুন ষড়জ-ঋষভের স্বরানুপাত, প্রকৃতির বা হার্মনিকের নিয়মে যা হওয়া উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, স্বরের আপেক্ষিক অবস্থানই সুরবোধ জাগায়, স্বরের চরম অবস্থানের কোনো সাংগীতিক মূল্য নেই।

পিয়ানো-জাতীয় নির্দিষ্ট পর্দার যন্ত্রে সুরকে সমঝোতার পথে যেতেই হবে। ষড়জ থেকে কোমল ঋষভ, তারপর শুদ্ধ ঋষভ, কোমল গান্ধার, শুদ্ধ গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম, তীব্র মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত, শুদ্ধ ধৈবত, কোমল নিষাদ, সবশেষে শুদ্ধ নিষাদ—একসপ্তকে এই বারোটি মূল স্বরস্থান। সমঝোতা সূত্র হলো, যেকোনো স্বর হতে তার ঠিক পরবর্তী স্বরের মূল কম্পাঙ্কের অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা অর্থাৎ সব স্বরের জন্যই সমান। এই ধ্রুব সংখ্যাটি দুইয়ের দ্বাদশ মূল। দুইয়ের দ্বাদশ মূলের অর্থ হলো, দ্বাদশবার এই সংখ্যাটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে গুণ করলে উত্তর পাওয়া যাবে দুই। অর্থাৎ, ষড়জের মূল কম্পাঙ্ককে এই ধ্রুবসংখ্যা দিয়ে গুণ করলে পৌঁছে যাব কোমল ঋষভে, আরেকবার গুণ করলে পাব শুদ্ধ ঋষভ, এইভাবে দ্বাদশবার গুণ করলে পাব ষড়জের মূল কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ বা উপরের সপ্তকের ষড়জ। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে সপ্তক সম্পর্কটি বজায় থাকে, কিন্তু হার্মনিকের নিয়মলব্ধ আর কোনো স্বরসম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ষড়জের মূল কম্পাঙ্ককে সাতবার এই ধ্রুবসংখ্যা দিয়ে গুণ করলে পঞ্চমের মূল কম্পাঙ্কে পৌঁছোনোর কথা, কিন্তু এই পদ্ধতিতে তা ষড়জের কম্পাঙ্কের ঠিক দেড়গুণ হয় না, যদিও দেড়গুণের কাছাকাছি হয়। পিয়ানোর পর্দার স্বরস্থান নির্ধারণের এই পদ্ধতিকে equal temperament বলা হয়।

দুঃখের বিষয়, শুধুমাত্র পিয়ানো-জাতীয় নির্দিষ্ট পর্দার যন্ত্রকে পশ্চিমি ধ্রুপদী সংগীতে ঠাঁই দিতে, গত কয়েক শতাব্দী ধরে এই সংগীতের স্বরস্থান সরে গেছে হার্মনিক স্বরস্থান বা প্রকৃত সুর থেকে। সম্বাদী স্বর আর ঠিক সম্বাদী নেই, তার অপভ্রংশ হিসেবে টিকে আছে।

এই আলোচনাটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। নতুবা আমরা আইনস্টাইনের প্রশ্ন ও তার জবাবে রবীন্দ্রনাথের প্রায় হেঁয়ালিভরা উত্তরের তাৎপর্য বুঝতে পারতাম না। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বলেছিলেন, পিয়ানো তাঁকে বিভ্রান্ত করে, বরং বেহালা তাঁর অনেক বেশি ভালো লাগে। বেহালায় নির্দিষ্ট পর্দা নেই, আঙুলের অবস্থান অনুযায়ী ইচ্ছেমতো সুর বাজানো যায়, অর্থাৎ এই যন্ত্রের একক প্রয়োগ হলে তাতে স্বরস্থানের প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করতে হয় না।

আমাদের পর্যালোচনার এই পর্যায়ে এসে আইনস্টাইনের প্রশ্নটিকে প্রশ্নের চেয়ে বেশি ক্ষোভের মতো শোনায়। এই কবি ও বিজ্ঞানীর মনীষা এতই গভীর ও তীক্ষ্ণ ছিল যে, সংগীতের প্রতি এই সংবেদনশীলতা ও বোধে উপনীত হতে তাঁদের কোনো সংগীততত্ত্ববিদের ব্যাখ্যা বা লেকচার শুনতে হয়নি।

ইনভেনশন নয়, ডিসকভারি

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতরচনায় একদিকে যেমন এই বাংলার বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যবাহী ধ্রুপদী রাগসংগীতকে আশ্রয় করেছেন, ঠিক তেমনই দেশকাল ঘরানার সীমা ডিঙিয়ে বিভিন্ন সংগীতধারাকে তাঁর গানে বরণ করে নিয়েছেন। আবার অনেকসময় সুরের প্রচলিত প্রথা ভেঙে নতুন দিক খুলে দিয়েছেন, কিন্তু কখনোই প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করেননি। বৃক্ষের মূলকাণ্ড বেয়ে আরোহণ করা যায়, তা থেকে তার শাখায় যাওয়া যায়, শাখা থেকে প্রশাখাতেও যাওয়া যায়, কিন্তু তিনি বৃক্ষের অবয়বের বাইরে যাননি কখনোই। তিনি সুরের গতিপ্রকৃতির কিছু নতুন দিকদর্শন করেছেন, একে ইনভেনশন না বলে ডিসকভারি বলব, ঠিক যেমনটি তানসেন করেছিলেন মিয়াঁ মল্লার বা দরবারি কানাড়া রচনায়, বা আজকের দিনের রবিশঙ্কর-আলি আকবর ঈশ্বরীগোষ্ঠীর রাগ রূপায়ণে বা মেধাবী ও চন্দ্রনন্দন রাগকল্পনায়। প্রকৃতির নিয়মের বাইরে গিয়ে এসব নয়, তার মাঝে থেকেই নতুন কিছু পথের দিশা দেখানো।

প্রকৃতি থেকে দূরে যাওয়ার অর্থ মানুষের থেকেও দূরে যাওয়া—পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের ক্ষেত্রে এ কথা আইনস্টাইন উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতির নিয়মে যে স্বরসম্বাদ তা আসলে কোনো নিয়মই নয়, মানুষকে এই নিয়ম আলাদা করে জানতে হয় না, শ্রবণের আনন্দ থেকে এই সম্বাদ আপনা-আপনিই বেরিয়ে আসে, তার জন্য কোনো বিশেষ প্রথা, আহৃত জ্ঞান বা প্রস্তুতির দরকার নেই। ছাত্রস্থানীয় একজনকে যেমন আলি আকবর একবার বলেছিলেন, রাগের সুরে ডুবে যাও, দেখবে সে-ই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, নিজে থেকে কিছু করতে যেও না যেন। সুরের কাছে, প্রকৃতির কাছে এই সমর্পণ আধ্যাত্মিকতার একটি দিক। আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ এদিকে যাননি—হয়তো যাওয়া যেত, আমরাও আর যাব না।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানের কথা বলেছেন, উত্তর-পশ্চিম ভারতের গানের কথাও বলেছেন, এইসব গানে কথার প্রয়োগ বা কাব্যবহির্ভূত সুরের বিমূর্ত রূপের কথাও বলেছেন, কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় বা

কর্ণাটকি সংগীতের উল্লেখ করেননি। তথ্যের সম্পূর্ণতার জন্য বলতে পারতেন, তবে প্রয়োজন ছিল না। ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরায় উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত আজ চেহারায় কিছুটা আলাদা, কিন্তু তাদের স্বরস্থানের উৎপত্তি প্রকৃতির একই নিয়মে। একই মেলডিক ভিত এই দুই সংগীতধারার, যদিও রাগরাগিণীর নামকরণ ও প্রচলনের ভেদ এবং সংগীত পরিবেশনে আঙ্গিকের তফাত নিশ্চয়ই আছে। আনুমানিক ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে রচিত ভারতীয় রাগসংগীতের ওপর প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ মাতঙ্গামুনির *বৃহদ্দেশী*-তে স্বরস্থান, শ্রুতিভেদ ইত্যাদির উল্লেখ আছে, রাগরাগিণীর কথা আছে, কিন্তু মাতঙ্গ নিজে দক্ষিণ ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও যতদূর জানি দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটকি সংগীতের কোনো পৃথক উল্লেখ নেই। এসব বিভেদ পরে টানা হয়েছে এবং বেঙ্কটমখী কয়েকশো বছর আগে কর্ণাটকি সংগীতের মেলপদ্ধতি প্রচার করে এই বিভেদে স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছেন। এই ৭২ মেল উত্তর ভারতীয় সংগীতেও একই রকমভাবে প্রযোজ্য—কারণ স্বরস্থানের উৎপত্তি একইভাবে। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভাতখণ্ডে মশায় এরই একটি অতি সরলীকৃত রূপ হিসেবে ১০টি মেল বা ঠাটের প্রচলন করেন উত্তর ভারতে। সংগীতশিল্পীরা কোনোদিনই এই ১০ ঠাটের ভাতখণ্ডীয় রীতিকে তেমন আমল দেননি, কারণ বহু রাগরাগিণীকেই এই ১০ টি মাত্র ঠাটের কাঠামোর মধ্যে ফেলা যায় না, আর সংগীত পরিবেশনার সময় এই ১০ ঠাট বা ৭২ মেলকে বিশেষ মনে রাখার দরকার নেই, এগুলি হয়তো সংগীত বিশ্লেষণকে কিছুটা সাহায্য করে মাত্র। মহৎ সংগীতের অনির্বচনীয় এক মাত্রা থাকে, কাগজ-কলমের বা বচনের কোনো বিশ্লেষণই তার নাগাল পায় না। আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ পরিশেষে এ কথা উল্লেখ করেছেন। এঁদের কথোপকথনকে কেন্দ্র করে সংগীত নিয়ে অনেক বাক্যব্যয় আমরা করলাম ঠিকই, কিন্তু মহৎ সংগীত শ্রবণ এর থেকে ঢের বেশি উত্তম কাজ। অতএব আমরা এবার উপসংহার টানব। শেষ প্রসঙ্গো আসি।

সংগীতের জনবিচ্ছিন্নতা

আইনস্টাইন যেমন অকপটে স্বীকার করে নিলেন যে, পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীত সাধারণ মানুষের থেকে দূরে চলে গিয়ে তার নিজের প্রথায় আবদ্ধ হয়ে আছে, রবীন্দ্রনাথ কি ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রসঙ্গ গোপন করে গেলেন? মনে হয় না। ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের শেষ কয়েকশো বছরের ইতিহাসে ঘরানাদারির বাড়াবাড়ি ছিল, গোপনীয়তা ছিল, কিন্তু এসব ঘটেছিল আর্থ-সামাজিক বাধ্যবাধকতায়, কোনো সংগীতিক অবক্ষয়ের কারণে নয়। সংগীতের প্রতি তাঁরা যত্নবান ছিলেন। মাটির সাথে প্রকৃতির সাথে এঁদের যোগাযোগ কখনোই ছিন্ন বা শিথিল হয়নি। রাজা বাদশারা এঁদের কলার গুণগ্রাহী হলেও সাধারণ মানুষের সাথেও এদের সাংগীতিক ও সামাজিক যোগাযোগ ছিল। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে এই সংগীতের চর্চা ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝে অত্যল্প দেশকালের পরিসরে আলাপচারী এই দুজন। কাল অনন্ত নয়, তবে এঁদের উপলব্ধির তল পাওয়া ভার। এঁদের অনুভূতির সাথে কোথাও বিশ্বরহস্যের নাড়ির যোগ আছে। ব্যক্তিগত হয়েও এঁরা মহাজাগতিক। আকাশের জল আর এঁদের চোখের জল বোধ হয় একই কারণে ঝরে।